শিরোনামঃ কৃষিভিত্তিক উৎসব ও তার পর্যালোচনা

শুভনীল জোয়ারদার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া
ই-মেল : shuvoneel@rediffmail.com

সারসংক্ষেপ *ঃ যন্ত্র নির্ভর মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানুষকে উৎসব বিমুখ করে তুলেছে। বিগত প্রজন্মের উৎসবগুলো নতুন প্রজন্মের কাছে যেন এক বিস্ময়। কিন্তু মানুষের মানবিকতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে উৎসবকে জানা, পালন করা ও অংশ গ্রহণ করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। কারণ উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানান সামগ্রীর দোকান, দেবদেবীর পুজো অর্চনা, নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্বলিত মানুষের মনের মিলন মেলা। যার প্রভাব গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। খাদ্য হল জীবন ধারণের অপরিহার্য্য বস্তু, যার উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম হল কৃষিকাজ। তাই কৃষিভিত্তিক উৎসব পালিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। ভারতের ৪৮ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত।আর এই প্রতিবেদন হল, কৃষিভিত্তিক উৎসব কে সীমিত সামর্থের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।*

সূচক শব্দ *ঃ কৃষি, ফসল, উৎসব, সভ্যতা, টুসু, পুরুলিয়া, নবান্ন।*

ভূমিকা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কৃষিকাজের মাধ্যমে নিশ্চিত খাদ্যের সংস্থান আবিষ্কারের পরেই মানুষ যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে স্থায়ী জীবনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ উৎসবপ্রিয় মানুষ তাই কৃষিকাজকে উপলক্ষ করে সৃষ্টি করেছে কৃষিভিত্তিক উৎসব ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্বাদে, ভিন্ন আঙ্গিকে, যেখানে কল্পিত দেব-দেবী প্রসঙ্গ নিতান্তই ভক্তি মিশ্রিত সংস্কার মাত্র।আর গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই কৃষিভিত্তিক উৎসব কেন্দ্রিক মেলার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে।

টুসু উৎসব

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া,পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলার এবং ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যের একটি উল্লেযোগ্য কৃষিভিত্তিক উৎসব। 'টুসু'এখানে কুমারী লৌকিক দেবী হিসাবে পূজিত হন বলে, কুমারী মেয়েরাই এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। ড: মাহাতোর মতে তুষ থেকে টুসু কথাটা এসেছে (১)। আর দীনেন্দ্র সরকারের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রজননের দেবতা টেম্মুব থেকে টুসু কথাটা আসতে পারে (২)। এই উৎসব অগ্রহায়ন সংক্রান্তি থেকে শুরু করে মাঘের প্রথম দিনে শেষ হয়। শুরুর দিন সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা চালের গুঁড়ো লাগান একটি পাত্রে তুষ রেখে তার উপর ধান, গোবরের মন্ড, দূর্বা ঘাস, আল চাল, আকন্দ-বাসক-গাঁদা-কাচ ফুলের মালা সাজিয়ে পাত্রটির গায়ে হলুদ রঙের টিপ দিয়ে কুলুঙ্গি বা পিঁড়িতে স্থাপন করে তাকে 'টুসু'দেবী হিসাবে প্রতিদিন পুজো করা হয় (৩)। উৎসবের প্রধান চারটি পর্বের মধ্যে, পৌষ মাসের শেষ তিন দিন 'চাঁউরি', 'বাঁউরি', 'মকর' এবং মাঘের প্রথম দিন 'আখান' নামে পালিত হয়।

গোবর মাটি দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করে চালের গুঁড়ো তৈরি করা কে বলে চাঁউরি। দ্বিতীয় টির বৈশিষ্ট্য হলো চাঁচি, তিল, নারকেল বা মিষ্টি পুর দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির গরগরা বা বাঁকা বা উধি এবং পুর পিঠে তৈরি করা, টুসু গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে টুসু জাগরণের জন্য ঘর পরিষ্কার করে ফুল-মালা-আলো দিয়ে সাজিয়ে মিষ্টি, পিঠে, ছোলা-মটর ভাজা, মুড়ি, জিলিপি প্রভৃতি দিয়ে দেবীর কাছে

ভোগ নিবেদন করা (৪)। মকরের দিন ভোরে বাঁশ বা কাঠের তৈরি রঙিন কাগজ এ মোরা চতুরদোলায় টুসু দেবীকে বসিয়ে বিভিন্ন দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে টুসু সজ্জা নিয়ে বক্রোক্তি সহযোগে তর‍্যা গান করতে করতে নিকটস্থ পুকুর বা নদীতে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যায়। বিসর্জনের পর মেয়ে রা নতুন বস্ত্র পরিধান করে আর ছেলেরা খড়, কাঠ, পাটকাঠি সহযোগে নির্মিত ম্যারা ঘর পুড়িয়ে আনন্দে মেতে ওঠে (৫)। মাঘ মাসের প্রথম দিনটি কুর্মি বা মাহাত সম্প্রদায়ের কাছে কুর্মালি নববর্ষ উপলক্ষে শুভ কাজের জন্য প্রশস্ত মনে করে। 'এখ্যান যাত্রা' বা 'আখান' পালিত হয় (৬)। এই দিন পুকুর থেকে মাটির তাল সংগ্রহ করে। 'খেলাই চন্ডী' দেবীর চরণে উৎসর্গ করে মঙ্গল কামনা করা হয়। অনেকে পুকুর থেকে স্নান করে দন্ডী কেটে দেবীর থানে যায়। ছোট ছোট মাটির হাতি-ঘোড়া দেবীর থানে নিবেদন করে ভক্তরা মানত করে। বড় মেলা বসে, প্রচুর লোকসমাগম হয়। এটি পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত চিলা গ্রামের এক প্রাচীন জাকজমক মেলা।

প্রাচীন নিয়মে টুসু উৎসবে কোন মূর্তির প্রচলন না থাকলেও পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান ও বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানায় টুসু মূর্তির প্রচলন আছে। হলুদ বরণ গায়ের রঙ ও নীল শাড়ি পরিহিত বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অশ্ব বা ময়ূর বাহিনী মূর্তিগুলোর হাতে শঙ্খ বা পাতা বা বরাভয় মুদ্রা দেখা যায় (৭)। সুখ-দুঃখ-কল্পনা-সামাজিক প্রথা ভিত্তিক লৌকিক ও দেহগত প্রেম (৮) বা মেয়েলি কলহ, বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা, স্বাক্ষরতা (৯) প্রভৃতি বিষয়গুলি টুসু গানের বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে-টুসু আরাধনা: পৌষ এসেছে সাধের টুসু, পুজব তমাল ফুল দিয়ে, তোমার ক্ষেতের ধান তুলেছি, সে ধান যাবে কে লিয়ে..., টুসুর বিয়ে: আমার টুসুর বিয়ে দুব ইস্টিশনের বাবুকে, ওলো টুসু ভালই হল চাপবি কত গাড়িতে..., কুমারী টুসু: টুসু যাবে নদীর ধারে একলা যেতে দিওনা,সড়ক ধরে চলে যাবে, করো পানে চেয়োনা...(১০)। পূর্বতন বিহারের অন্তর্গত পুরুলিয়া কে ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে বঙভুক্তির পূর্বে টুসু গানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল। বিহারের অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ভজহরি মাহাত রচিত এরকম একটি গানের শেষ চার লাইন হল- 'বাংলা ভাষার দাবীতে ভাই, কোন ভেদের কথা নাই। এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে, মাতৃ ভাষার রাজ্য চাই।' তাই টুসু উৎসব এই অঞ্চলে এক বিশেষ ভাবাবেগের স্থান দখল করে আছে।

করম পরব

করম হল শক্তি, যুবা ও যৌবনের দেবতা আর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশীতে এই দেবতার আরাধনা করাই হল করম পরব। এটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উরিষ্যা, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যের কুর্মি, লোহার, বাউরি, খেরিয়া, শবর, মাহালি, হারি, বাগদি, বেদে, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আরণ্যক কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব। এক সপ্তাহ আগে ভোর বেলা মহিলারা জলাশয়ে স্নান করে বাঁশের বোনা টুপা ও ডালায় বালি ভর্তি করে সেগুলিতে তেল হলুদ মাখানো বুট, মটর, মুগ, জুনার,কুথথির বীজ বুনে 'জাওয়া গান' গেয়ে তাদেরকে তিন পাক ঘুরে জাওয়া ডালা তৈরি করে। যে ডালা তে একাধিক বীজ বোনা হয় তাকে সাঙ্গী জাওয়া আর একটি বীজ বোনা হলে তাকে একাঙ্গী জাওয়া বলে। এই পর্বটি জাওয়া পরব ও প্রাসঙ্গিক গান জাওয়া গান হিসাবে বর্ষাকালীন শস্য উৎসবের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত। শস্য রোপণের সাথে জমির উর্বরতা যেমন প্রাধান্য পায়, তেমনি মানুষের বিশ্বাস সন্তান ধারণের জন্য কন্যাদের মধ্যে উর্বরা ক্ষমতা অধিক। তাই এখানে নাচ গান কুমারীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। গাছ ও পাতা নিয়ে লেখা জাওয়া গানের উদাহরণ হল-'শাল তলার বালি আলো জাওয়া পাতার লো,এমনি জাওয়া লগ্ন হবে বাঁশ পাতা টার পারা লো' (১১)।

পরের দিন গোবর লেপে আল্পনা দিয়ে দেওয়ালে সিঁদুরের দাগ ও কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়। বয়স্ক গ্রামবাসীদের করা নির্দিষ্ট স্থানে অন্য পুরুষেরা দুটো শাল বা ছাতা গাছের ডাল পুঁতে রাখে। সন্ধ্যার পর ডাল দুটি করম ঠাকুর ও ধরম ঠাকুর হিসাবে পূজিত হয়। সারাদিন

উপোষের পর সন্ধ্যায় ফুল-ফল-নৈবেদ্য সহযোগে এই স্থানে কুমারী বা সদ্য বিবাহিত নারীরা ঝুমুর গান গেয়ে সমস্ত রাত ধরে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত লুঙ্গি, গামছা বা শাড়ি ও রুপোর গয়না পরে, মাথায় ফুল দিয়ে সেজে অর্ধবৃত্তাকার এ হাত ধরাধরি করে এক পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে জাওয়া ডালা গুলিকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে ঘুরে যে নাচ করে তাকে বলে করম নাচ। নাচের সময় গৃহ কাজ, কৃষি কাজ ফুটিয়ে তোলা হয়। একজন উচ্চস্বরে গান শুরু করে এবং তার পর ধীরে ধীরে সেই গানের সুর নামিয়ে এনে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটান হয় (১২)। পর দিন পুজো শেষে মহিলারা একে অপরকে ডোর বা রাখি পরিয়ে বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার শপথ নেয়। সকাল বেলা জাওয়া থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলো কে তুলে ভাগাভাগি করে নিজেদের বাড়িতে ছড়িয়ে দেয়। তার পর করম ডাল কে জলে ভাসানো হয় (১৩)।

বাঁধনা পরব

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কুর্মী, গোয়ালা, সাঁওতাল, নাপিত, লোধা, মুন্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব হল বাঁধনা পরব। গরুদের সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম দিয়ে আমন ধান চাষের শেষে তাদের বন্দনা করাই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। আবার কারও মতে বাঁধনা শব্দ এসেছে বন্ধন থেকে, কারণ এই পরবের শেষে ভাইফোঁটার দিন খুঁটিতে গরুদের বেঁধে শারীরিক কসরৎ করানো হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপুজোর পর দিন এই পরবে 'অহীরা'গান গাওয়া হয়। এটি কৃষিভিত্তিক লোক সঙ্গীত। গরুদের জাগরণের জন্য পুরুষ কণ্ঠে সমবেত ভাবে মাদল, ধামসা প্রভৃতি বাজিয়ে গান করে গরুর জীবনপ্রনালী ও বৈশিষ্ট্য প্রশ্নোত্তরের মত ব্যাখ্যা করা হয় (১৪)।

এই পরবের প্রথম ধাপে আছে গোঠ পূজা। অমাবস্যার দিন গোয়ালের গরু মোষ এর শিঙে তেল মাখিয়ে গ্রামের এক স্থানে একত্র করা হয়। মাঠের ভিতর চালের গুঁড়ো দিয়ে ঘর কেটে ছাঁদন ও বাঁধন দড়ির পূজা করা হয়, যা হল গোঠ পূজা। পুজো শেষে মাঠে আল্পনা এঁকে তার ভিতর ডিম রেখে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে একত্রিত গরু মোষ গুলিকে মাথায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে ধানের শীষ দিয়ে সাজান হয় (১৫)। দ্বিতীয় ধাপে, অমাবস্যার সন্ধেবেলা বাড়ির তুলসী তলা,কুয়োতলা প্রভৃতি স্থানে কাঁঠাল বা শাল গাছের পাতায় রাখা চালের গুঁড়ো র ভিতর সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালান হয়। এটাকে বলে কাচিজিয়ারি (১৬)। তৃতীয় ধাপে, নতুন কাপড় পরে গৃহিণীরা কুলোয় ধান, দুর্বা, আম পল্লব, হলুদ জল, ধূপ ধুনো নিয়ে গরুকে বরণ করে গোয়ালে ঘি এর প্রদীপ ও উঠোনে কাঠের আগুন জ্বেলে রাখে। এর পর বাজনা বাজিয়ে অহীরা গান গেয়ে গ্রামের যুবকেরা গরু জাগরণের জন্য বাড়িতে আসলে, তাদের অর্থাৎ ধাঙারিয়া দের সাথে গৃহিণীরা চালের গুঁড়ো মিশ্রিত পিটুলী গোলা দিয়ে হোলি খেলে স্বাগত জানায় (১৭)।

চতুর্থ ধাপে, অমাবস্যার পর দিন গৃহকর্তা (হিন্দু মতে, স্বামী বা পূজনীয় ব্যাক্তিদের গোঁসাই বলে) জমি থেকে আনা এক আঁটি ধানের শীষ দিয়ে নির্মিত অলঙ্কার গরু মোষ এর শিংয়ে পরান এবং চাষের যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের পর পুজো করে ঘরের ছাদে রেখে আসেন। মাঘ মাসের প্রথম দিন সেগুলিকে হাল পুনহার (পরে পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে) সময় আবার নামিয়ে আনা হয় (১৮)। শেষ ধাপ, গরু খুঁটা। ভাই ফোটার দিন নির্বাচিত গরু মোষ এর গায়ে লাল ছোপ দিয়ে, কপাল ও শিং এ তেল সিঁদুর মাখিয়ে, গলায় মালা ঘন্টা ঘুঙুর বেঁধে তাদের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। এরপর বাজনা বাজিয়ে অহীরা গান ও নাচের সঙ্গে তাদের উত্তেজিত করলে, সামনে রাখা মৃত গরুর চামড়া দেখে প্রতিপক্ষ ভেবে খোঁটা তে বা গুঁতো তে আসে, তাই এই শেষ ধাপ গরু খুঁটা বা বুঢ়ী বাঁধনা নামে পরিচিত (১৯)। এই ধাপের গাওয়া গানের একটি উদাহরণ হল-'এতদিন চরালি ভালা, কোচা খুঁদি রে, আজ তো দেখিব মরদানি, চার ঠেঙে নাচবি,দুই শিঙে মারবি,রাখিবি বাগাল ভাইয়ের নাম....।'

গরইয়া

কার্তিক মাসের প্রতিপদ তিথিতে গৃহকর্তা স্নানের পর গোয়ালে বসে ধূপ, সিঁদুর, আতপ চাল, গাওয়াঘি, পিঠে দিয়ে সামনে রাখা পিঁড়ি র উপরএঁটেল মাটিতে গোঁজা নীলাভ শালুক ফুলকে পুজো করা কে গোহাল পূজা বলে।

গরুর গোয়ালে লাল মোরগ আর মোষের গোয়ালে কালো মুরগী বলি দেওয়া হয়। গরু মোষ এর শিঙে তেল সিঁদুর মাখিয়ে মাথায় ধানের শীষের পরিয়ে গৃহকর্তী উলু দিয়ে গাভী পুজো করে, যাহা 'গরু চুমা' নামে পরিচিত। উৎসবের শেষে সন্ধ্যার সময় চালের গুঁড়োর সাথে পানিয়া নামক লতার রস উঠোনে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে কারো নজর না লাগে। তাই এটা 'চোখ পুরা' নামে পরিচিত (২০)। এই উৎসবটি পুরুলিয়া জেলার কৃষিভিত্তিক উৎসব।

রহিন উৎসব

রোহিন নক্ষত্র ১৩ই জৈষ্ঠ্য পৃথিবীর কাছে আসায় ওই দিন বীজ বপন করলে শস্য উৎপাদন নির্বিঘ্ন হয়, এই বিশ্বাস থেকে পুরুলিয়ার কৃষকেরা এই দিন রহিন উৎসব পালন করে। ভোরে গোবর দিয়ে উঠোন লেপে, আল্পনা এঁকে, স্নান সেরে , ভেজা কাপড়ে মহিলারা মাঠ থেকে মাটির তাল বানিয়ে ঘরের চার কোণে ও তুলসী বেদীতে সাজিয়ে রাখে। এই মাটিকে রহিন মাটি বলে। পুরুষেরা কেলেকড়া ফল নিয়ে এসে কাচা দুধের সাথে মিশিয়ে জিভে ঠেকায়। এই ফল গুলিকে রহিন ফল বলে। আয় বেশি, খরচ কম এরকম বাড়ির সদস্যদের দিয়ে বীজ বোনা হয়। আর বাড়ির ছোট সদস্যরা রং কালি দিয়ে বানর ভালুক সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ ও খাবার সংগ্রহ করে (২১)।

হাল পুনহা

পুরুলিয়া জেলার প্রধানত কুরমী জনজাতি, মাঘ মাসের প্রথম দিন সকালে হলকর্ষণ উপলক্ষে এই উৎসব পালন করে। এর জন্য নতুন পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি হয় বেউনী ও বরহি। গোবরে লেপা পরিষ্কার খামারে তিনটে শাল কাঠ পুঁতে উনুন তৈরি হয়। আতপ চাল, ঘি, গুড়, দুধ, গাঁজা একত্রে উনুনে জ্বাল দিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধা হয় এবং গৃহস্থ কৃষক স্নান সেরে সেই ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করে। তারপর বাড়ি, খামার বা জমিতে হাল গরু সমেত আড়াই পাক ঘুরিয়ে তাদের শিঙে সর্ষের তেল মাখানো হয়। এরপর সংগৃহীত গোবরের ওপর আড়াই বার কোদাল কুপিয়ে, গ্রামের কোন গাছের তলায় ঘি,গুড়, সিঁদুর, আতপ চাল দিয়ে পুজো করে পশু বলি দেওয়া হয় (২২)।

নবান্ন

বাংলার কৃষিভিত্তিক উৎসব গুলির মধ্যে প্রায় হাজার বছরের পুরনো সর্বোত্তম উৎসব হল, নবান্ন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলাদেশে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রহায়ন মাসে কাটা আমন ধানের চালের প্রথম রন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করেই নবান্নের অবতারণা (২৩)। নবান্নের অর্থ নতুন অন্ন, আর এই অন্ন পিতৃপুরুষ, দেবতা, কাক দের উৎসর্গ করাই এই উৎসবের রীতি। লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী কাকের মাধ্যমে এই খাদ্য মৃত আত্মার কাছে পৌঁছে যায় বলে, এই নৈবেদ্য কে কাকাবলী বলে (২৪)।

অতীতে পৌষ সংক্রান্তির দিন এই উৎসব পালিত হলেও কোথাও কোথাও মাঘ মাসে এই উৎসব পালিত হয়। এই গার্হস্থ্য উৎসবে গৃহকর্তা পরিবারবর্গ সহ নতুন গুড় দিয়ে নতুন অন্ন গ্রহণ করে (২৫)। নবান্ন উৎসবে গ্রামাঞ্চলে হয় গ্রামীন মেলা, যেখানে নাচ গান খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির আয়োজন থাকে।

নবান্নের সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত উপজাতি সম্প্রদায়ের কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-(ক) সোহরায় উৎসব: প্রজাপতি, কুরমী, মুন্ডা, ওঁরাও রা পৌষ মাঘ মাসে শীতকালীন প্রধান ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে এই উৎসব পালন করলেও মূলত এটি সাঁওতাল উপজাতির প্রধান উৎসব (২৬), (খ) চামোইনাত: জুম চাষী রা এই উৎসবে মুরগী বলি দিয়ে তার মাংস আর নতুন ধানের ভাত সহযোগে সবাই মিলে ভুরিভোজ করে, (গ) ওয়ানগালা: মেঘালয় ও আসামের গারো উপজাতি নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফসল তোলার পর, ফল ও ফসলের প্রাচুর্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পানাহার ও নাচ গানে এই উৎসব পালন করে (২৭)।

ওনাম

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কেরালাতে নতুন ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব পালিত হয়, তাকে বলে ওনাম (২৮)। এই উৎসবে ঘর সাজানো, আল্পনা দেওয়া, নতুন বস্ত্র পরিধান, রাসাম-পায়াসাম-আভিয়াল-লাল চালের

ভাত-পারিপ্পু কারি দিয়ে অতিথি অ্যাপায়ন, নৌকা বাইচ, বাঘ নৃত্যের আয়োজন প্রভৃতি করা হয়। এটি মালায়ালাম ক্যালেন্ডার বা মালয়ালি জনগোষ্ঠীর নববর্ষের দিন সূচিত করে। এদের বিশ্বাস, এই সময় ভগবান বিষ্ণুর অবতার বামন ও রাজা মহাবলির পূণ্য আগমন ঘটে (২৯)।

পোঙ্গল

তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি রাজ্যে ১৫-১৮ জানুয়ারি নতুন ফসল কাটার উৎসব হিসাবে এটি পালিত হয়। পোঙ্গল কথার অর্থ হল, অন্ধকারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন ভাবে আলোর কামনা করা। অনেকের মতে, এই কথার যথার্থ মানে হলো প্রাচুর্যে বা উপচে পড়া। আবার অনেকের মতে এর বাংলা মানে হলো বিপ্লব। যাই হোক, এই উৎসবের মূল আরাধ্য দেবতা হলেন সূর্য ও তাঁরই কাছে সব কিছু উৎসর্গ করা হয় (৩০)।

প্রথম দিন পর্যাপ্ত বৃষ্টির কামনা করে ইন্দ্রের পুজো করা হয়, যা 'ভোগালি পোঙ্গল' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দিন, নতুন ধানের চাল আর দুধ দিয়ে তৈরি পায়েস ভোগ হিসাবে সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়, যা 'সূর্য্য পোঙ্গল' নামে পরিচিত। তৃতীয় দিনে হয় গবাদি পশুর পুজো, যা 'মাটটু পোঙ্গল' নামে পরিচিত (৩১)। চতুর্থ বা শেষ দিনে লাল চালের ভাত, হলুদ, পান আর সুপারি দিয়ে পুজো করা হয়, আল্পনা দিয়ে বাড়ি ঘর সাজানো হয়, ধান ঝাড়ার পর পড়ে থাকা অবশিষ্ট খড়ে আগুন জ্বেলে পরিবারের সমৃদ্ধি কামনা করা হয় (৩২)।

লোহরি

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু, শিখ এবং কিছু মুসলমানেরা এই কৃষিভিত্তিক উৎসবটি পালন করে (৩৩)। পাঞ্জাবি দিন পঞ্জিকার সৌর অংশ অনুসারে উৎসবের দিনটি সাধারণত নির্ধারিত হয় এবং বেশির ভাগই সেটা হয়,১৩ই জানুয়ারি (৩৪)।এই উৎসবে শীতে আগুন জ্বালিয়ে প্রধান ফসল গম, আখ প্রভৃতির চারপাশ ঘিরে নাচ, গান করা হয় (৩৫)। অনেকের মতে লোহরি নামকরণের সাথে জড়িয়ে আছে সমাজসংস্কারক কবির দাসের স্ত্রী লোয়ের নাম।

ভোগালি বা মাঘ বিহু

এটি আসামের অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসব। বিহু শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতের মধ্যে একটি হল, বিশু থেকে উৎপন্ন হয়েছে বিহু। এখানে 'বি' এর অর্থ প্রার্থনা আর 'শু' অর্থ শান্তি ও সমৃদ্ধি। জানা যায়,১২২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আহোম' রাজত্ব কালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিহু উৎসবের সূচনা হয়েছিল। জানুয়ারি (১৪-১৫) বা মাঘ মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিজস্ব পোষাকে নাচ-গান-খাওয়া দাওয়া করে এবং সেই সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই, পাখির লড়াই প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সুঙ্গা পিঠে, তিল পিঠে, নাড়ু প্রভৃতি এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। ভোগালি কথার অর্থ, ভোগ খেয়ে আনন্দ করা। উৎসবের শেষে আগুন জ্বালিয়ে অগ্নি দেবতাকে প্রার্থনা জানানো হয় (৩৬)।

এ ছাড়া নুয়াখাই, খিচড়ি, উওরায়ন ও তিলগুল হল যথাক্রমে উড়িষ্যা, বিহার, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের প্রধান কৃষিভিত্তিক উৎসব। আলোচিত প্রায় সব উৎসব গুলোই শীত কালে অনুষ্ঠিত হয়, কারণ এটাই যে ফসল তোলার সময়।

উপসংহার

উৎসব হল মানুষের গতানুগতিক একঘেয়েমি জীবনে একটুকরো বৈচিত্র্য। উৎসব পালন হল, জীবনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা সাময়িক ভাবে ভুলে থাকার একটা অস্থায়ী অবলম্বন স্বরূপ। তাই মানুষ নিজের তাগিদেই উৎসব সৃষ্টি করে, যার ভিত্তি নির্ভর করে দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা মানুষের শুভ চিন্তা শক্তির উপর। আধুনিক আন্তর্জাতিক গবেষকদের মতে, প্রায় ২৩০০০ বছর আগে প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল, খাদ্য উৎপাদনের নিশ্চয়তার তাগিদে। তাই কৃষিভিত্তিক উৎসব করার ব্যাপারে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, আছে শুধু উৎসব পালনের রীতি নীতি র ফারাক। আর মেলা হল, উৎসবের প্রাণ ভোমরা। উৎসব নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন যে, দিনগত মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী হলেও উৎসবের দিনে সবাই একত্রিত হয়ে বৃহৎ ও মহৎ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১। ডঃ বঙ্কিম চন্দ্র মাহাতো, ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য, প্রথম বাণী শিল্প শোভন সংস্করণ, জানুয়ারি২০০০,পৃ.১০২।

২। দীনেন্দ্র নাথ সরকার, টুসু ব্রতের উৎস চিন্তা, টুসু ইতিহাস ও সঙ্গীতে,পৃ.১৭।

৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পুরুলিয়া, ফার্মা কে.এল. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,২০০৯,পৃ.২৬৬।

৪। দিলীপ কুমার গোস্বামী, সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, পারিজাত প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২৪ ডিসেম্বর,২০১৪,পৃ.৩৮।

৫। তদেব,পৃ.৩৮,৩৯।

৬। মকর পর্বে উৎসবের মেজাজ, আনন্দ বাজার পত্রিকা অনলাইন, প্রথম পাতা, নিজস্ব সংবাদদাতা,ঝাড়গ্রাম,১৫ জানুয়ারি, ২০১৫।

৭। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৬১।

৮। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৬৭।

৯। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৪১-৪৩।

১০। দিব্যজ্যোতি মজুমদার, টুসু ইতিহাসে ও সঙ্গীতে, অ্যাকাডেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা,১৯৮২,পৃ.৫৫।

১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক সাহিত্য ৩ খন্ড, কলকাতা,১৯৫৪,পৃ.১২১।

১২। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৬৩,৬৪।

১৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৫৫-২৫৭।

১৪। দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্ববৎ,পৃ.৭৩,৭৪।

১৫। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৬২।

১৬। তদেব, পূর্ববৎ,পৃ.২৬৩।

১৭। তদেব।

১৮। তদেব,পৃ.২৬৪।

১৯। তদেব।

২০। নব কিশোর সরকার, লোকায়ত মানভূম, পুরুলিয়ার কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব, প্রকাশক-বঙ্কিম চক্রবর্তী,পৃ.২৩,২৪।

২১। তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পূর্ববৎ,পৃ.২৫২।

২২। নব কিশোর সরকার, পূর্ববৎ,পৃ.২০।

২৩। ডঃ দুলাল চৌধূরী সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,একাডেমী অফফোকলোর, কলকাতা,পৃ.৩২১-৩২২।

২৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলার লোক সংস্কৃতি, নেশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি,২০০৫,পৃ.৭০-৭১।

২৫। চিন্তা হরণ চক্রবর্তী, নবান্ন, ভারত কোষ, চতুর্থ খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা,১৯৭০,পৃ.১৬০।

২৬। Narendra Kumar Dasgupta–Problems of Tribal Education and the Santals–Bharatiya Adimjati Sevak Sangha–1963–P*f*50*f*

২৭। এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন, 'গারোদের ওয়ানগালা উৎসব', দৈনিক প্রথম আলো(বাংলা দেশের সংবাদ পত্র), প্রকাশক: মতিউর রহমান, সংগ্রহের তারিখ,১৪মে,২০২০।

২৮। Prabha Chopra,Onam-Most important festival of Kerala:held in Chingam(August-September), Encyclopedia of India,1998,P285.

২৯। M.Nazeer,The abiding lore and Spirit of Onam,The Hindu,10August 2010.

৩০। R.Abbas,History of People and Their Environs, S Ganesh and C Bhabani(ed.), Bharathi Puthakalayam, 2011,PP.751-752.

৩১। A Mani,Prakash Pravin,Shanthini Selvarajan,Mathew Mathews(ed.),Singapore Ethinik Mosaic,The Many Cultures,One People,World Scientific Publishing Company,Singapore, PP.207-211.

৩২। Vijay Ramaswamy, Historical Dictionary of the Tamils,Rowman &Littlefield Publishers, PP.274-275.

৩৩। এ বিষয়ে দরকারি বই—Asoka Jeratha,Dogra Legends of Art and Culture,Indus Publishing,1998.

৩৪। Dr.H.S.Singh,Sikh Studies, Hemkunt Press, 2005, P101-102.

৩৫। এই বিষয়ে দরকারি বই—Ramesh K Chauhan,Punjab and the nationality question in India, Deep and Deep Publications,1995.

৩৬। P.S.Sharma ;Seema Gupta,Fairs & Festivals of India,Pustak Mahal,2006,P.25.